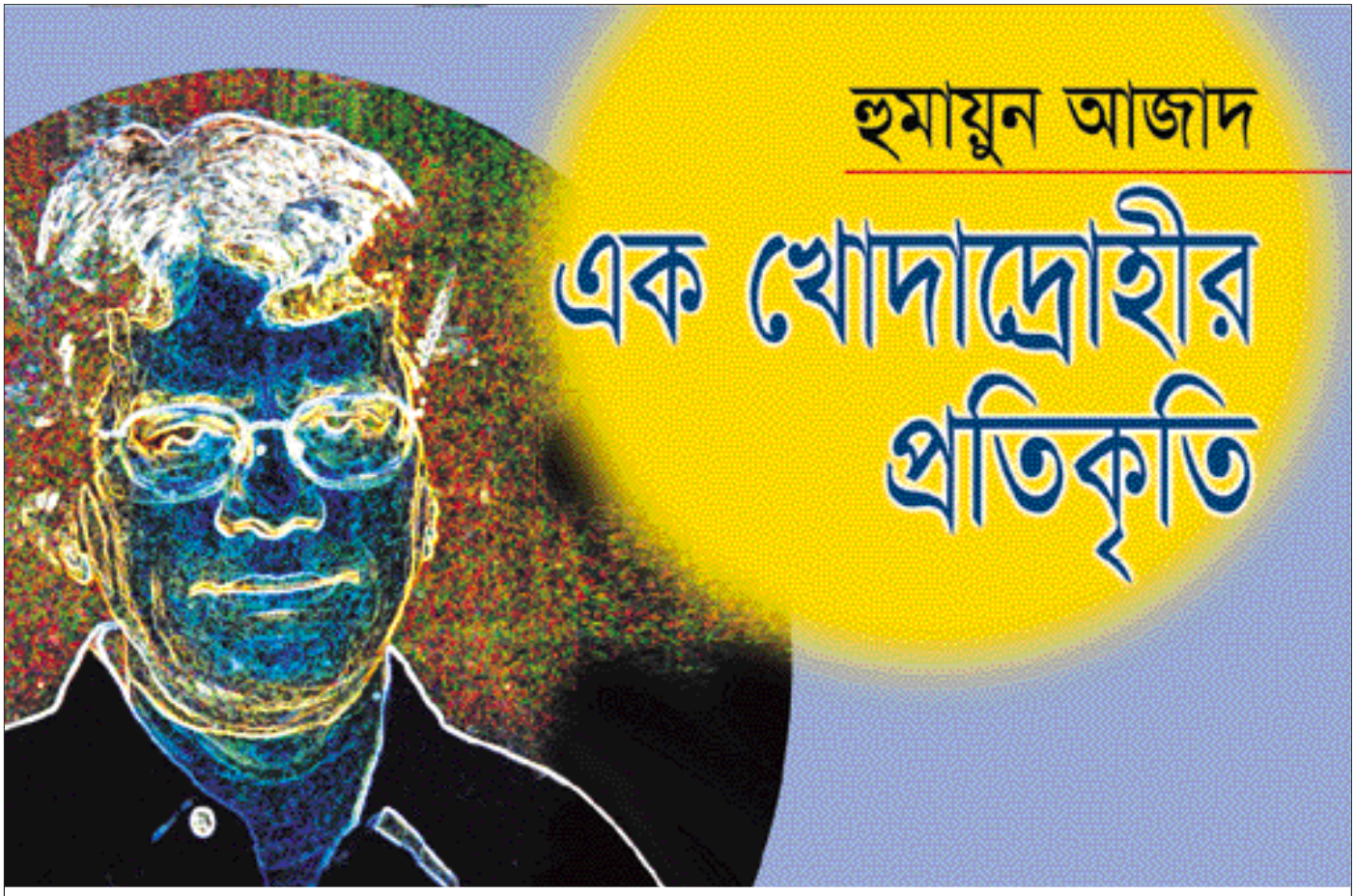

মাহমুদ কাসেম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক শিক্ষক ড. হুমায়ুন আজাদ ছিলেন এক স্বঘোষিত নাস্তিক ও খোদাদ্রোহী লেখক। তার বিভিন্ন লেখার পর্যালোচনা থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হলো, খোদা বা স্রষ্টা নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল তার জীবনের মিশন। তিনি লিখে গেছেন, স্রষ্টা, পাপ, পুন্য, স্বর্গ-নরক এসব মানুষের সৃষ্টি রূপকথা। কোরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন, ‘ ইসলামে কামসামগ্রী নারীর চূড়ান্ত রূপ হূর বা স্বর্গের উর্বশী। পুরুষের কামকল্পনা চূড়ান্ত রূপ ধরেছে হূর-এ। বেহেশত সম্পূর্ণরূপে পুরুষের প্রমোদপল্লী, সেখানে পার্থিব নারী বা স্ত্রীদের স্থান নেই।’ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি তথা মৌলিক বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে লেখা ছিল তার কাছে নেশার মতো। এ ধরনের আক্রমণাত্মক লেখা তিনি বিভিন্ন বইয়ে পৃষ্টার পর পৃষ্টাজুড়ে লিখে গেছেন। এ নিয়ে আদালতে মামলা এবং তার বই নিষিদ্ধ হওয়ার পর তার এ ধরনের লেখা আরো বেড়ে যায়।

ড. হুমায়ুন আজাদের লাশ গত ২৭ আগস্ট তার গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থানার রাঢ়িখালে দাফন করা হয়েছে। এর আগে ১২ আগস্ট জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কক্ষে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ড. আজাদের জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল। ৫৭ বছরের জীবন ছিল তার। এসময়ে তিনি ৬০টির বেশী বই লিখেছেন। এসব বইয়ের পাশাপাশি গণমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে তিনি প্রথাবিরোধী চমকপ্রদ কথা বলে সবসময় আলোচনায় থাকতে চাইতেন। দেশ, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নারী-পুরুষ সম্পর্ক এবং প্রধানত ধর্ম সম্পর্কে এমন সব চূড়ান্ত নেতিবাচক কথা তিনি বলতেন যা তাকে বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে যেত। জীবনে তিনি যেমন বিতর্কিত ছিলেন তেমনি বিদেশে-বিভূঁইয়ে তার মৃত্যু এমনকি দাফন নিয়েও অনেক বিতর্ক হয়েছে।

তসলিমার কপি নারীবাদী লেখায় প্রথম আলোড়ন

লেখালেখির অঙ্গনে হুমায়ুন আজাদের আবির্ভাব ঘটে ১৯৭৩ সালে 'অলৌকিক ইস্টিমার' নামে একটি কবিতার বইয়ের মাধ্যমে। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি 'জ্বলো চিতাবাঘ,' 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে,' 'যতোই ওপরে যাই নীল যতই গভীরে যাই মধু,' 'আমি বেঁচেছিলাম অন্যদের সময়ে,' 'কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু,' 'মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ,' 'রাজনীতিবিদগণ' ইত্যাদি বই লিখেছেন।

কবি-সাহিত্যিক মহলে কিছুটা আলোচিত হলেও এসব বই তাকে তার প্রত্যাশিত খ্যাতি এনে দেয়নি। দুই দশকের ক্রমাগত লেখালেখির পরও বৃহত্তর পাঠক সমাজে তিনি তখনো ছিলেন প্রায় অপরিচিত। নব্বুইয়ের দশকের শুরুর দিকে লেখালেখির ভুবনে তসলিমা নাসরিনের আবির্ভাব হয়। তসলিমা এ সময় চটি সাপ্তাহিকে মেয়েদের নিয়ে কলাম লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেতে থাকেন। তাই দেখে হুমায়ুন আজাদেরও শখ জাগে মুসলিম সমাজে মেয়েদের নানারকম বঞ্চনার বিষয় নিয়ে লেখালেখির।

এ বিষয়ে তসলিমা তার বহুবিতর্কিত ক বইয়ে লিখেছেন, 'হুমায়ুন আজাদ পূর্বাভাসে নতুন ধরনের কলাম লেখা শুরু করেছেন। রাজনীতি, সমাজ ইত্যাদি নিয়ে কৌতুক করা হুমায়ুন আজাদ এখন নারী নিয়ে লিখছেন। না, আগে যেমন তিনি নারীর বদনাম গেয়ে প্রবচন রচনা করেছিলেন তেমন নয়, এবারের লেখা নারীর গুণ গেয়ে। হুমায়ুন আজাদের লেখা তখনো আমার পড়া হয়নি। কিন্তু যেদিন নির্মলেন্দু গুণ আমাকে বললেন, হুমায়ুন আজাদ জনপ্রিয় হতে চাইছেন, তাই তোমার লেখা নকল করে তিনিও লিখতে শুরু করেছেন। পড়ে ঠিকই দেখি যে কথা আমি অনেক আগেই বলেছি, সে কথাগুলোই তিনি লিখছেন নতুন করে, তিনি বহু বই ঘেঁটে উদাহরণ দিচ্ছেন। আমি কোনও বই না ঘেঁটে মনে যা ছিল তাই লিখেছি, এই যা তফাৎ।'

হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কে তসলিমার এ অভিযোগ অনেকাংশে সঠিক। তসলিমা পবিত্র কোরআন- হাদিসের বিভিন্ন বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে প্রথমে বিতর্কিত এবং পড়ে গণরোষের কবলে পড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। হুমায়ুন আজাদও তাই করেন যদিও তাকে দেশ ছাড়তে হয়নি। এ বিষয়ে তসলিমার লেখার জবাব দিয়ে 'অকৃত্যাপনোদন' নামে একটি বই লিখেছেন অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত লেখিকা রওশন আরা বেগম। রওশন লিখেছেন, তসলিমার মতো "পবিত্র কোরআন ও হাদিস নিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশের সাথে সমালোচনা করেছেন হুমায়ুন আজাদও। অন্যান্য বিষয়ে তাদের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও ধর্মের বিষয়ে তারা এক ও অভিন্ন। হুমায়ুন আজাদ এ বিষয়ে এক ডিগ্রি চড়া। ধর্মকে নারী নির্যাতনের অন্যতম সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি ইসলাম ধর্মসহ সব ধর্মকে নাকচ করে দিয়েছেন। হুমায়ুন আজাদ তার নারী গ্রন্থে হিন্দু, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'যার বিধিগুলো এক বহুমুখী হিংস্র খড়গ, যা নারীর জীবনের দিকে উদ্যত হয়ে আছে, কয়েক হাজার বছর ধরে, এবং ওই খড়গের ধারাবাহিক বলি নারী।.. পুরুষ নিজে প্রণয়ন করেছে ওই নিষ্ঠুর সংহিতাগুলো, নারীকে স্থান দিয়েছে দণ্ডিতের শ্রেণীতে।"

হুমায়ুন আজাদ তার নারী গ্রন্থে পবিত্র কোরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার বাংলা অনুবাদের উদ্বৃতি দিয়ে লিখেছেন, "এর সারকথা হচ্ছে নারী অবাধ্য, অশুভ ও কামুক। তবে নারী তার কাম চরিতার্থ করতে পারবে না, পুরুষ নারীতে চরিতার্থ করবে কাম। ইসলামে কামসামগ্রী নারীর চরমরূপ হূর বা স্বর্গের উর্বশী। পুরুষের কামকল্পনা চূড়ান্ত রূপ ধরেছে হূর-এ। বেহেশত সম্পূর্ণরূপে পুরুষের প্রমোদপল্লী; অধিকাংশ নারী জ্বলবে দোজখে [হাদিসে আছে: দোজখ পরিদর্শনকালে আমি দোজকের দ্বারে দাঁড়ালাম এবং জানতে পারলাম যে দোজখীদের মধ্যে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ' : দ্র বোখারী শরীফ,২১৬], আর পুরুষেরা বেহেশতে রত থাকবে নিরন্তর ইন্দ্রিয়চর্চায়। হূররা চূড়ান্ত যৌনাবেদনময়ী নারী, যাদের দেহ হচ্ছে পুরুষের আদিম কামকল্পনার প্রতিমূর্তি।... বেহেশত পুরুষের বিলাসস্থল, সেখানে পার্থিব নারী বা স্ত্রীদের স্থান নেই। পৃথিবীতে তারা চুক্তিবদ্ধ দাসী, স্বর্গে অনুপস্থিত বা উপেক্ষিত। ইসলামী আইনে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এ-দৃষ্টিকোণ থেকেই।"

[নারী, হুমায়ুন আজাদ, পৃষ্টা ৮৩/৮৪, তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০০, আগামী প্রকাশনী]

হুমায়ুন আজাদের নারী গ্রন্থাকারে প্রথম বেরোয় ১৯৯২ সালে। আগামী প্রকাশনীর প্রকাশিত ৪০৮ পৃষ্ঠার

বইটি দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। ১৯৯৫ সালে এক সরকারী আদেশে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয়, 'পুস্তকটিতে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি তথা মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী আপত্তিকর বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক ফৌজধারী কার্যবিধির ৯৯ 'ক' ধারার ক্ষমতা বলে পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করা হইল।'

এই নিষেধাজ্ঞা হুমায়ুন আজাদের জন্য শাপেবর হয়ে দাঁড়ায়। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় তার পক্ষে -বিপক্ষে লেখালেখি হয়। অখ্যাত হুমায়ুন আজাদ দ্রুত বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ২০০০ সালের ৭ মার্চ উচ্চ আদালতের রায়ে নারী নিষিদ্ধকরণ আদেশ বাতিল ঘোষণা করা হয়। নারী নতুন কলেবরে পুন:প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে হুমায়ুন আজাদ পরে একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বিএনপি সরকার দয়া করে আমার নারী বইটি নিষিদ্ধ করেছিল।' এ সময় থেকেই হুমায়ুন আজাদ দু:সাহসী হয়ে ওঠেন। তিনি দেশ, সমাজ ও ধর্মবিরোধী লেখা বাড়িয়ে দেন। একের পর এক তিনি লিখে যান, 'আমার অবিশ্বাস,' 'সবকিছু ভেঙে পড়ে,' 'ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য,' 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম' এবং সর্বশেষ 'পাক সার জমিন সাদ বাদ।' এসব বইয়ে হুমায়ুন আজাদ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকেই তার আক্রমণের মূল টার্গেট করেন। একইসঙ্গে তিনি এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোকেও আঘাত হানতে থাকেন। এর মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধীচক্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ফলে তার বই প্রকাশ ও বাজারজাতকরণের সুযোগ বেড়ে যায়। প্রায় একই ধরনের ঘটনা এর আগে ঘটেছে তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রেও। তসলিমার লজ্জা উপন্যাস বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করাতেই তিনি রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা বনে যান। ভারত এবং পাশ্চাত্যের কিছু দেশে তিনি অনেক পৃষ্ঠপোষক পান।

এতেই বোঝা যায়, ধর্ম সম্পর্কে তসলিমা নাসরিন কিংবা হুমায়ুন আজাদের অপব্যাখ্যার প্রতিকার তাদের বই নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে হয় না। বরং এক্ষেত্রে যা দরকার তা হলো, তসলিমা এবং হুমায়ুন আজাদ তাদের লেখায় যে তথ্য, যুক্তি ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন তার পাল্টা তথ্য, যুক্তি ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা। বইয়ের জবাব বই বা কলমের জবাব কলম দিয়ে দেয়া দরকার। এ জবাব সীমিত পরিসরে হলেও ইসলামী ধারার বই ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সে জবাব দেয়ার জন্য একদিকে যেমন দরকার মেধাবী লেখক তেমনি দরকার প্রকাশক ও সুধী মহলের পৃষ্ঠপোষকতা। এদিক থেকে বাংলাদেশের প্রকাশনা ও লেখালেখির ভুবন অনেকাংশেই নাস্তিক্যবাদের অনুকূলে। আস্তিকতার সংস্কৃতি এদেশে অনেকাংশেই অবহেলিত। এই অবহেলার মধ্যেও সরকারি কর্মকর্তা রওশন আরা বেগম নিতান্তই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অকৃত্যাপনোদন নামের বইটি প্রকাশ করেছেন। ২৪১ পৃষ্টার এ বইয়ে তসলিমা ও হুমায়ুন আজাদের নারী বিষয়ক ধর্মীয় অপব্যাখ্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।

রওশন আরা লিখেছেন, ''তসলিমা নাসরিন ও হুমায়ুন আজাদ উভয়েই নারী মুক্তির লক্ষ্যে পৃথিবীতে বিদ্যমান যাবতীয় ধর্মকে বাতিল করেছেন। আসলে ধর্মের মধ্যে যা কিছু অপব্যাখ্যা, যা কিছু কুসংস্কার তারা উভয়েই সেগুলোকেই ধর্ম জ্ঞান করেছেন।... ধর্মের বিষয়ে নতুন করে ছড়িয়েছেন হুমায়ুন আজাদেরই ভাষায় 'অন্ধকার, রচনা করেছেন অভিনব কুসংস্কার।'...ধর্মের মৌলিক আদর্শের অনুসন্ধান না করে, বিশ্লেষণাত্মক ও গবেষণাধর্মী অনুবাদকে উপেক্ষা করে, কিছু হালকা ও প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মন্তব্য/মতামতের ওপর নির্ভর করে, এবং বেশ কিছু জাল ও অগ্রহণযোগ্য হাদিস অবলম্বনে তারা ইসলাম ধর্মের যে সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কিছুই ধর্মের যথার্থ ব্যাখ্যা হয়নি, হয়েছে ধর্মের মৌলিক আদর্শের অবমূল্যায়ন এবং পুন:অপব্যাখ্যা মাত্র।''

রওশন আরা প্রসঙ্গত ড. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান', ড. শমসের আলী ও অন্যদের লেখা 'সায়েন্টিফিক ইন্ডিকেশন ইন দ্য হলি কোরআন,' প্রফেসর শাহ মনজুর আলমের 'সায়েন্টিফিক সিগনিফিকেন্স ইন সিলেকটেড কোরআনিক ভার্সেস'সহ ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন আকর গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে নাস্তিক্যবাদীদের বক্তব্যের অন্ত:সারশূন্যতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আক্রোশ ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে

ধর্মের বিরুদ্ধে হুমায়ুন আজাদের আক্রোশ ছিল সবচেয়ে বেশী। এই আক্রোশ তিনি তার বিভিন্ন লেখায় ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে অবাধে প্রকাশ করেছেন। তার বিতর্কিত হওয়ার কারণও মূলত এ ধরনের লেখালেখিই। আমার অবিশ্বাস গ্রন্থে ড. আজাদ লিখেছেন, 'ধর্ম এবং ধর্মের বইগুলো অলৌকিক নয়, ধর্মের বইগুলো জ্ঞানের বইও নয়; পঞ্চম শ্রেণীর বই পড়লেও যতোটা জ্ঞান হয়, ধর্মের বইগুলো পড়লে ততোটা জ্ঞানও হয় না, বরং অনেক অজ্ঞানতা জন্মে। বিশ্বাস ও অজ্ঞানতা পরস্পরের জননী; জ্ঞান জন্মে অবিশ্বাস থেকে। বিশ্বাস মাত্রই অপবিশ্বাস; জ্ঞান বিশ্বাসের বিষয় নয়, জানার বিষয়। কোনো ধর্মপণ্ডিত যদি সারা জীবন ধর্মের বই ও তার ভাষ্য পড়ে, আর কিছু না পড়ে, সে থেকে যায় পঞ্চম শ্রেণীর শিশুটির থেকেও মূর্খ।'

তিনি সবসময় যুক্তি ও বিজ্ঞানের কথা বলতেন। কিন্তু ধর্মকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি যুক্তির সীমা লংঘন করতেন। বৈজ্ঞানিক কোনো পদ্ধতি অনুসরণ না করেই প্রতিপক্ষকে কলমের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত করতেন। অশ্লীল-কল্পকাহিনীর মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মানুষের জীবন দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় আঘাত দিয়ে তিনি প্রচুর লিখে গেছেন।

ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য গ্রন্থে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'ধর্মানুভূতি কোনো নিরীহ ব্যাপার নয়, তা বেশ উগ্র; এবং এর শিকার অসৎ কপট দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা নয়, এর শিকার সৎ ও জ্ঞানীরা; এর শিকার হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানের সাথে ধর্মের বিরোধ চলছে কয়েক সহস্রক ধরে, উৎপীড়িত হতে হতে জয়ী হচ্ছে জ্ঞান, বদলে দিচ্ছে পৃথিবীকে: তবু আজো মিথ্যে পৌরাণিক বিশ্বাসগুলো আধিপত্য করছে, পীড়ন করে চলছে জ্ঞানকে। ধর্মানুভূতির আধিপত্যের জন্যে কোনো গুণ বা যুক্তির দরকার পড়ে না, প্রথা ও পুরনো ভুল বই জোগায় তার শক্তি, আর ওই শক্তিকে সে প্রয়োগ করতে পারে নিরঙ্কুশভাবে। উগ্র অন্ধ ধর্মানুভূতি বিস্তারের পেছনে কাজ করে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি ও রাজনীতি। দরিদ্রের শিক্ষালাভের সুযোগ নেই, তাই জ্ঞানের সব এলাকাই তার অজানা; তার জ্ঞানহীন মনের ভেতর প্রতিবেশ সহজেই সংক্রমিত করে অযুক্তি ও অপবিশ্বাস; আর তাতে সে খুঁজে পায় শান্তি ও শক্তি। তার কিছু নেই বলে তার সাথে থাকে এক অলৌকিক মহাশক্তি, যা তাকে বাস্তবে কিছু দেয় না, কিন্তু মানসিকভাবে মাদকের মতো সবল করে রাখে। দুর্নীতি ধর্মের পক্ষে কাজ করে; দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা নিজেদের অপরাধ ঢেকে রাখার জন্যে জাগিয়ে তোলে ধর্মীয় উগ্রতা। তাই সমাজে যত দুর্নীতি বাড়ে তত বাড়ে ধর্ম।

রজনীতিবিদেরা ব্যবহার করে ধর্মকে; তারা দেখতে পায় ক্ষমতায় যাওয়ার সহজ উপায় ধর্মের উদ্দীপনা সৃষ্টি; তাদের কল্যাণ করতে হয় না মানুষের, বিকাশ ঘটাতে হয় না সমাজের- এগুলো কঠিন কাজ; সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকা। কিন্তু এতে সমাজ নষ্ট থেকে নষ্টতর হতে থাকে, যা এখন ঘটছে বাংলাদেশে। রাষ্ট্রকে মুক্ত হওয়া দরকার পৌরাণিক আবেগ থেকে, কেননা পৌরাণিক আবেগ গত কয়েক সহস্রকে মানুষের কল্যাণ করেনি, ক্ষতিই করেছে; এবং আজো ক্ষতি করে চলছে।'

খোদাদ্রোহী লেখালেখির নমুনা

লেখালেখিতে হুমায়ুন আজাদের খোদাদ্রোহ সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে তার চারটি বই পড়াই যথেষ্ট। বইগুলো হচ্ছে, নারী, ধর্মানুভূতির উপকথা, আমার অবিশ্বাস এবং পাক সার জমিন সাদ বাদ। আমরা এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

ধর্মানুভূতির উকথায় হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'গত তিন দশকের বাংলাদেশি রাজনীতির এক প্রধান, হিংস্র, ও কুৎসিৎ ব্যাপার ধর্ম, যা আমাদের ফিরিয়ে নিচ্ছে মধ্যযুগের দিকে।...মানুষের কল্যাণের কোনো শক্তি বা লক্ষ্য নেই বাংলাদেশী রাজনীতিবিদদের, কিন্তু তাদের ক্ষমতায় যেতে হবে, ক্ষমতায় থাকতে হবে; এবং তারা বুঝতে পেরেছে জনগণকে ধাপ্পা দেয়ার সহজ ও শস্তা উপায় হচ্ছে ধর্ম। তাই তারা মেতে উঠেছে ধর্মে; বিসমিল্লায়, ইনশাল্লায়, আলহামদুলিল্লায়, রোজা, নামাজ, হজ, ওমরা, মিলাদ ও মসজিদে; এবং ধার্মিক ছদ্মবেশে।..সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে তরুণ-তরুণীরাও মেতে উঠেছে ধর্মে বা ধর্মের আনুষ্ঠানিকতায়।'

আল্লাহ, খোদা, স্রষ্টা, পাপ, পুণ্য, পরকাল- এসবে বিশ্বাস ছিলনা হুমায়ুন আজাদের। এ বিষয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে তিনি রূপকথা মনে করতেন। ধর্মীয় শব্দাবলী তার কাছে ছিল উপহাসের বিষয়।

আমার অবিশ্বাস গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'মহানিরর্থকতায় ভয় পেয়ে কতোগুলো শিশুতোষ রূপকথা তৈরি করতে

পারি আমরা, যেমন করেছি ধর্মের রূপকথা, তৈরি করেছি স্রষ্টা, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ আর নরক'।

মৃত্যু সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'মৃত্যু হচ্ছে জীবন প্রক্রিয়ার উল্টানো অসম্ভব পরিসমাপ্তি; আর ফেরা নেই, আর অগ্রগতি নেই; চিরকালের জন্য থেমে যাওয়া।...আমি জানি ভালো করেই জানি, কিছু অপেক্ষা করে নেই আমার জন্যে; কোনো বিস্মৃতির বিষণ্ন জলধারা, কোনো প্রেতলোক, কোনো পুনরুত্থান, কোনো বিচারক, কোনো স্বর্গ, কোনো নরক; আমি আছি আমি একদিন থাকবো না, মিশে যাবো, অপরিচিত হয়ে যাবো, জানবো না আমি ছিলাম। নিরর্থক সব পুণ্যশ্লোক, তাৎপর্যহীন সমস্ত প্রার্থনা, হাস্যকর উদ্ধত সমাধি; মৃত্যুর পর যে-কোনো জায়গাতেই আমি পড়ে থাকতে পারি, জঙ্গলে, জলাভূমিতে, পথের পাশে, পাহাড়ের চূড়োয়, নদীতে, মরুভূমিতে, তুষারস্তুপে। কিছুই অপবিত্র নয়, যেমন কিছুই পবিত্র নয়; কিন্তু সবকিছুই সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর এই তাৎপর্যহীন জীবন।'

পক্ষপাত ছিল মদ নারী ও বহুগামিতায়

মদ পান, ব্যভিচার, বহুগামিতা এসব ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ এসবের পক্ষে বলতেন। তিনি সুযোগ পেলেই গল্পের আকারে নারী-পুরুষের বহুগামিতার পক্ষে চমকপ্রদ কথা বলতেন। তার লেখালেখির একটা বড় অংশ জুড়ে এসব থাকতো। আমার অবিশ্বাস গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'আমি কয়েকজন নারীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি- তারা হেসেই উড়িয়ে দেন নারীর একনিষ্ঠতার ধারণা, জানান যে বাধ্য হয়েই তারা একনিষ্ঠ, যদিও তাদের স্বামীরা বহুগামী। এক তরুণী, যার প্রথম বিয়ে ভেঙে যায় কয়েক মাসেই, এবং দু-মাসের মধ্যেই আরেকটি বিয়ে করে, তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম দুটি পুরুষের সাথে সংসর্গে তার মনে কোনো অপরাধবোধ জন্মেছে কিনা। তরুণী হেসে উঠে বলে- কী যে বলেন, স্যার, এতেই তো মজা।'

একই বইয়ে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'মদের বিরুদ্ধে মুসলমান জগতে একটা বড় অপপ্রচার চলে বলে এই চমৎকার বস্তুটির ভাবমূর্তি বেশ নষ্ট হয়ে গেছে; এবং মুসলমান পরিবারে খামোখা গোলমাল লেগে থাকে।.. মদ্যপান একেবারেই খারাপ নয়; আমি খাই, শামসুর রাহমান খান এবং খায় লাখ লাখ বাঙালী ও মুসলমান এবং খেয়েছেন গ্যালিলিও, নিউটন, শেক্সপিয়ার, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন; খান অজস্র সচিব, সম্পাদক, অধ্যাপক, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাষ্ট্রপতি, উপাচার্য, বিচারপতি, দূত, পুলিশ। নিষেধ মানসিক রোগ সৃষ্টি করে; মুসলমান যখন মদ খায়, তার মনে অপরাধবোধ জন্মে, কেননা পরিবার ও সমাজ তাকে মনে করে মাতাল। দেখে খারাপ চোখে। অনেককে জানি আমি যারা মদ খেয়ে বাসায় ফেরার আগে খান প্রচুর পান সুপারি জর্দা, কেউ কেউ চিবোন পেয়ারা পাতা; অনেকে অপরাধবোধে ভুগে ভুগে পুরোপুরি মাতাল হয়ে হয়ে পড়েন, কাঁদতে থাকেন, বাসায় আর ফিরতে পারেন না।'

কাম সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'কাম নিয়ে শুরুতে মানুষের উদ্বেগ ছিল না; কামকে তারা তখন উপভোগ করেছে অপরাধবোধে না ভুগে। কিন্তু যেই দেখা দিতে থাকে সম্পত্তি ও সম্পত্তির অধিকার, পুরুষ ক্রমশ হয়ে উঠতে থাকে প্রভু, বুঝতে পারে সন্তান উৎপাদনে তার ভূমিকা, তৈরি করে কতকগুলো কৃত্রিম সংস্থা- বিয়ে, পরিবার, সমাজ, তখনই কাম হয়ে উঠতে থাকে মানুষের বড় উদ্বেগ, স্বর্গচ্যুতি ঘটে মানুষের। এর আগে নারী কাম উপভোগ করেছে দেহপ্রাণ ভরে; কিন্তু পুরুষ বিয়ে, পরিবার, সমাজ তৈরি করে ছিনিয়ে নেয় নারীর কামসুখ, তাকে ভেঙেচুরে বিন্যস্ত করে নিজের নিচে, কিন্তু খোলা রাখে নিজের কামসুখের সমস্ত দরোজা ও সরণী। পুরুষ নিজের জন্য রাখে বহুপত্নী, অজস্র উপপত্নী, এবং অসংখ্য পতিতা। পুরুষ থেকে যায় বহুগামী, কিন্তু ভুলতে পারে না যে নারীও ছিল বহুগামী, এবং তার বহুগামিতার শক্তি পুরুষের থেকে অনেক বেশি।'

সতীত্ব সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ লেখেন, 'পুরুষ নিজের সুবিধা ও সুখের জন্য সৃষ্টি করে একনিষ্ঠতা, সতীত্ব নামে নানা নৈতিক ধারণা; তবে পুরুষ কখনোই আর সৎ থাকেনি, কিন্তু নারীকে বাধ্য করেছে একনিষ্ঠ ও সতী থাকতে, এবং সব সময়ই সন্দেহ করেছে নারীর সতীত্ব সম্পর্কে।'

তার চোখে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা লম্পট সন্ত্রাসী নেশাখোর

গল্প উপন্যাসের নামে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চরিত্র হনন ও বিকৃতরূপে তুলে ধরাই ছিল তার প্রধান কাজ।

এসব বর্ণনা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যের অপলাপ। দেশের প্রকৃত বাস্তবতার দূরবর্তী প্রতিফলনও এসব নয়। এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চরিত্রহীন, লম্পট, সন্ত্রাসী, নেশাখোর হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করতেন তিনি । দৈনিক ইত্তেফাকের ২০০৩ সালের ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তার সবচেয়ে বিতর্কিত উপন্যাস 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'। পরে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের বই মেলায় এ উপন্যাসের তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।

এ উপন্যাসের দু'একটি দৃশ্যপটের বর্ণনা পড়লেই বোঝা যায় তিনি কিভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করতেন। এ উপন্যাসের একটি দৃশ্যপট এরকম :

কোরবান আলি আরেকবার ছহবত করতে করতে বলতে থাকে, 'অ, আমার লাইলাতুল কদর, এমুন সুক আর আমি পাই নাই, তুমি আমার বিবি, বুড়িডারে তালাক দিমু, তোমার দ্যাহ ভইর‍্যা মদু।'

মিস লাইলাতুল কদর বলে, 'মদু পাইবা, কাইলই বিয়া করতে অইব মদু খাইতে চাইলে, নাইলে মদু বিষ হইয়া যাইব।'

কোরবান আলি বলে, 'তোমার মদু ছারা আমি বাচুম না, তুমি চিন্তা কইর‍্য না, কাইল নাইলে পশশুই তোমারে শাদি করুম।'

মিস লাইলাতুল কদর বলে, 'তাইলে আরেকটু মদু খাও, দরজাটা আটকাইয়া লও, ভাল কইর‍্যা খাও, জানি আমিও মদু পাই।'

কোরবান আলি বলে, 'ক্যান, লায়লাতুল কদর, তুমি মদু পাও নাই?'

মিস লাইলাতুল কদর বলে, 'বুড়ির লগে হুইতে হুইতে তুমি মদু খাইতে আর খাওয়াইতে ভুইল্যা গ্যাছ, তোমারে শিখাই দিমুনে। তোমার শাবলডা ঢিলা অইয়া গ্যাছে, ওইডারে শক্ত করতে অইব, নাইলে খুড়বা ক্যামনে?'

কোরবান আলি বলে, 'হ, ঠিকই কইছ, বিবি লায়লাতুল কদর, ওই বুড়িডা ভাল কইর‍্যা চিৎঅ অইতে পারে না, কোনমতে কাম সারতে অয়।'

লায়লাতুল কদর বলে, 'আর আমার কাম?'

কোরবান আলি ব্যাপারি বলে, 'তুমি বিবি হুরগো ছারাই গেছো। তোমার জান্নাতুল ফেরদাউসে আমি দিনরাইত ঢুইক্যা থাকুম।'

থ্রিএক্স ডিনামাইট কচি পোলা ইত্যাদি

পাক সার জমিন সাদ বাদের অন্য এক দৃশ্যপটে বলা হয় :

"মো: হাফিজুদ্দিন হুইস্কির গেলাশে একটি বড় চুমুক দিয়ে, এক্সএক্সএক্স ছবিটার একটি দৃশ্য রিওয়াইণ্ড করে, বলে, 'হুজুর, জিহাদি জোশে আপনার দিল আইজও ভইর‍্যা ওঠে নাই। তয় আপনের কতার ওপর কতা নাই, কয়ডা ডিনামাইট মাটির নিচে জমা কইর‍্যা রাকছি, পরে কামে লাগামু, ইনশাল্লা।'

আমি বলি, 'মো: হাফিজউদ্দিন ব্রিজটা তুমি ভাঙতে চাও, তা খুবই উত্তম। তারপর কি একটি দোয়া পড়ে ওটি বানাতে পারবে?'

মো: হাফিজউদ্দিন খুব বিব্রত হয়, বলে, 'হুজুর এমুন দোয়া অহনও পাই নাই।"

এ উপন্যাসের আরেকটি দৃশ্যপটের বর্ণনা :

"ইছলামের নামে খুন করলে পাপ নাই, আর ইহা খুন না, ইহা হইল কাফের সরাইয়া আল্লার রাজ্য স্থাপন; তাইলে জান্নতুল ফেরদাউছ পাওয়া যাইব, যেইখানে হুরদের লগে দিনরাইত ছহবত করতে পারবা। ইসলামের জইন্য একেকটা কাফের মারবা একেকটা হুর পাইবা, সোভানাল্লা।'

‘মুরতাদগো খুন করলে জান্নতুল ফেরদাউছ পাইবা, সেইখানে হুরদের সঙ্গে শরাবন তহুরা খাইয়া রাইত দিন কাটাইবা, সেইখানে ছহবত আর ছহবত করবা, দুনিয়ার ছহবতের থিকা অই ছহবত ৭০ কোটি গুণ মিঠা, সোভানাল্লা।’

‘সেইখানে তোমাগো জইন্য আছে গেলমান, কচি পোলা, তাগোও তোমরা পাইবা, কচি পোলার স্বাদের কোন তুলনা নাই, সোভানাল্লা।’

‘এই দুনিয়ার মালাউন মাইয়াগো জেনা করলে দোষ নাই, গুনাহ্ নাই, তারা হইল গনিমতের মাল, এই বয়সে তোমাগো ছহবত করনের দরকার, মালাউনগো মাইয়াগো লগে করবা, তাইতে গুনাহ নাই, সোভানাল্লা।’

এক তরুণীকে চুইংগামের মতো চুষতে চেয়েছিলেন

নিজের চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে ড. আজাদ আমার অবিশ্বাস গ্রন্থে লিখেছেন,‘কেঁপে উঠেছিলাম

কামনায়, অজস্রবার তৃপ্ত করেছিলাম আমার কামনা এবং বহুবার পরিতৃপ্ত করতে পারিনি।’

দুই কন্যা ও এক পুত্রের জনক হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত এ বইয়ে আরো লিখেছেন,‘আজও অনেক কিছু চুষে আর চেখে দেখতে ইচ্ছে করে।... কয়েক বছর আগে সারা সন্ধ্যা চুষতে-চিবুতে ইচ্ছে হয়েছিল চুইংগামের মত এক তরুণীকে।... আমার ত্বক সুখী হয়েছে অনেক ধরনের ছোঁয়ায়; আমি যত ছুঁতে চেয়েছি; তার চেয়ে বেশি ছোঁয়া চেয়েছি।... কোনো কোনো নারী দেখলে ছুঁতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ছুঁই না; সবকিছু ছোঁয়া অনুমোদিত নয়। ওষ্ঠ দিয়ে ছোঁয়া নিবিড়তম ছোঁয়া, আমি যা কিছু ওষ্ঠ দিয়ে ছুঁয়েছি তারাই আমাকে সুখী করেছে সবচেয়ে বেশি। আমাদের সমাজে ছোঁয়া খুব নিষিদ্ধ ব্যাপার; আমরা খুব কম মানষকেই ছুঁতে পারি, খুব কম মানুষকেই ছোঁয়ার অধিকার আছে আমাদের। ছোঁয়া এখানে পাপ; কোনো নারী যদি কোনো পুরুষকে ছোঁয়, কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে ছোঁয়, তাতে সূর্য খসে পড়ে না, আকাশে হুলস্থূল শুরু হয়ে যায় না; কিন্তু আমরা মনে করি মহাজগৎ তাতে কেঁপে উঠছে। ..কিন্তু আমি ছুঁয়েছি, ছোঁয়া পেয়েছি, তাতে চাঁদ তারা খসে পড়েনি। ছুঁয়ে এবং ছোঁয়া পেয়ে আমি যে সুখ পেয়েছি, তা আর কিছুতে পাই নি।’

তার পতিতা বয়ান

ধর্মানুভূতির উপকথা গ্রন্থে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে হুমায়ুন আজাদ বলেন, ‘রাষ্ট্র ভাত দিতে পারেছে না, কিন্তু সতীত্ব রক্ষার জন্য খুবই ব্যগ্র; যদিও রাষ্ট্র যারা চালায়, তাদের গোপন জীবনকাহিনী আমাদের বেশ জানা আছে। ...আবাসিক এলাকার পতিতারা বেশ শিক্ষিত, রূপসী, অনেকে মডেল, অনেক নায়িকা, গ্রাহকেরা ব্যবসায়ী, আমলা, সেনাপতি।..অর্থকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কেউ কেউ হয়তো গোপন পতিতার পেশাকে বেছে নেয়। এই মেয়েদের কোনো দোষ নেই; দোষ যা-কিছু তা রাষ্ট্রের। কারণ রাষ্ট্রই এসব যুবতীদের পতিতা বানিয়েছে।’

জীবনের মতো মরণও বিতর্কিত

হুমায়ুন আজাদ এ ধরনের লেখালেখির জন্য জীবনে যেমন বিতর্কিত ছিলেন মৃত্যুর পরও তাকে নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। জীবনে তিনি আল্লাহ-খোদা বা ধর্ম বিশ্বাসের ধারে কাছেও যাননি। মৃত্যুর পর তার দেহ বাংলাদেশ মেডিকেলে দেয়ার কথা বলে গিয়েছিলেন। স্বঘোষিত নাস্তিক হিসেবে তার মৃতদেহের সৎকারের জন্য এটা করাই ছিল যুক্তি-সংগত। তার পরিবারের পক্ষ থেকেও প্রথমে এ কথাই বলা হচ্ছিল। এমনকি একটি পত্রিকায় ভুলক্রমে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কথা ছাপা হলে পরদিন তার পরিবারের পক্ষ থেকে সে ভুল শুধরে দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজকে তার দেহাবশেষ দিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে তার পরিবার সদস্যরা তাকে এদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে সমাহিত করার দাবী জানায়। এ বিষয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতেই তাকে ঘিরে নতুন বিতর্ক শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ইসলামপন্থী নানা সংগঠন তার পরিবারের এই ইচ্ছার বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন। ঢাকায় এ নিয়ে মিছিল সমাবেশও হয়। এরই ফলে শেষ পর্যন্ত তাকে তার জন্মস্থান বিক্রমপুরের

রাঢ়িখালে সমাহিত করা হয়।

এর আগে গত ১৫ আগস্ট নাগাদ তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে অনেক রহস্যের উন্মোচন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবী করা হয়। চেনা মহল থেকে এই মর্মে প্রচারণা চালানো হয় যে, তার মৃত্যুর জন্য দায়ী মৌলবাদীরা। তাকে ইনজেকশন অথবা বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে– এমন কথাও বলা হয়।

অন্যদিকে নিরপেক্ষ সূত্রে জানানো হয়, মুত্যুর আগে ড. আজাদ ঐ রাতে এক ককটেল পার্টিতে যান এবং সেখানে পানাহার পর্বে তিনি বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। এরপর তিনি তার কক্ষে ঘুমুতে যান। আর সেই ঘুমই ছিল তার শেষ ঘুম। তার মৃত্যু সম্পর্কে আন্তর্জাতিক লেখক সংস্থা পিইএন বা পেন-এর জার্মান শাখার সভাপতি ইয়োহানেস স্ট্রাসার জানান, হুমায়ুন আজাদ মারা গেছেন স্ট্রোকে। ঘুমের মধ্যে। ভোরের দিকে। জার্মান চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, খুবই ন্যাচারাল ডেথ। স্ট্রাসারের জবানীতে এই বিবরণ জার্মানি থেকে পাঠান দাউদ হায়দার নামে আরেক কবি, যিনি হুমায়ুন আজাদের মতই বিতর্কিত লেখার জন্য দেশ ছেড়েছেন অনেক আগে।

জার্মানীতে করা ময়না তদন্ত রিপোর্টেও তার মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে জানানো হয়। অথচ তার মৃত্যুকে ঘিরে এদেশে একটি মহল কফিনের রাজনীতি শুরুর পাঁয়তারা চালায়। ইতোপূর্বে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি যখন আততায়ীদের চাপাতির আক্রমণে গুরুতর জখম হন তখনো তাকে ঘিরে এরকম রাজনীতি চলে। সে সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে তাকে সরকারি খরচে প্রথমে দেশে এবং পরে ব্যাংককে যথাযথ চিকিৎসা দেয়া হয়। এরই ফলে তিনি সুস্থ হয়ে দেশে ফেরেন এবং দেশে এসে আবারও ধর্ম ও সরকার বিরোধী কড়া বক্তৃতা দেন।

ড. আজাদ গত ৮ আগস্ট মিউনিখ যান। পেন-এর আমন্ত্রণে এক বছরের একটি ফেলোশিপ নিয়ে তিনি সেখানে যান। জার্মান রোমান্টিক কবি হেনরিক হেইনের ওপর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার গবেষণা করার কথা ছিল। পাশাপাশি 'মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে ' নামে একটি নতুন বই লেখার কাজও তিনি শুরু করেছিলেন। তবে দাউদ হায়দার জানান, জার্মানীতে গিয়ে আজাদ স্ট্রাসারকে বলেন, 'মৌলবাদীদের হাত থেকে বাঁচা গেল অন্তত বছর খানিকের জন্য।'

মসজিদ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিষোদগার

ড. আজাদ তার জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত ধর্ম কর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। গত ২৩ জুলাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানবাধিকার ও লেখকের স্বাধীনতা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতায় অংশ নেন। এটি ছিল তার জীবনের সর্বশেষ আলোচিত বক্তৃতা। সেন্টার ফর হিউম্যান সিকিউরিটি আয়োজিত এই বক্তৃতায় ড. আজাদ দেশ ও সমাজ-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে অনেক বিতর্কিত কথা বলেন। সেদিন তিনি বলেন, প্রগতিশীল দলগুলোর এখন সময় হয়েছে দেশের মসজিদ মাদ্রাসায় খোঁজ নেয়া যে, এসব জায়গায় ধর্ম চর্চা হয় না অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হয়। মসজিদ-মাদ্রাসাকে পবিত্র স্থান গণ্য করা হলেও উগ্রপন্থীরা মসজিদকে ব্যবহার করছে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে। তিনি বলেন, দুর্নীতি, কালোবাজারি যত বাড়ছে , মসজিদ মাদ্রাসাও তত বাড়ছে। আমাদের দেশে মসজিদ-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক মৌলবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কালোবাজারিরাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছে। তিনি বলেন, মৌলবাদ শুধু মানুষের অধিকারই বিনষ্ট করে না, মানুষকেও বিনষ্ট করে। কারণ, মৌলবাদ কারও অধিকার স্বীকার করতে চায় না।

ড. আজাদ তখন আরো বলেন, বাংলাদেশ এই বন্যার চেয়েও মৌলবাদে প্লাবিত হয়েছে বেশী। জিয়াউর রহমান সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন করেছে এবং লম্পট, বদমাশ, স্বৈরাচার এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই রাষ্ট্রধর্ম হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ আমাদের দেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকারহীন করে তুলেছে। রাষ্ট্রধর্মের পরিণতি হলো বাংলাদেশের মৌলবাদ। এদেশে মানুষের অধিকারহীনতার কারণ মৌলবাদ ও রাষ্ট্রধর্ম। সউদী আরবে মানুষের বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। তিনি বলেন, আফগানিস্থানের মৌলবাদ বাংলায় রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশের টাকা এনে আমাদের দেশের মানুষকে মৌলবাদে দীক্ষিত করা হচ্ছে।

ড. আজাদের এসব কথা নিয়ে পত্রপত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনা শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা যান।

সত্য সন্ধানের স্বীকৃত রীতি অনুসরণ করেননি

কোনো বিষয়ের সত্য সন্ধানের একটা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত রীতি আছে। সেটি হলো, থিসিস, এন্টি- থিসিস থেকে সিনথিসিসে যেতে হয়। অর্থাৎ বক্তব্য, পাল্টা বক্তব্য থেকে সমন্বয় বা সিদ্ধান্তে যেতে হয়। এটি হলো, সমাজ বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় সত্য সন্ধানের একেবারে প্রাথমিক সূত্রসমূহের একটি। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ তার মতবাদ প্রচারে এ পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। প্রতিপক্ষের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে সত্য সন্ধানের পথে তিনি যাননি। অধিকন্তু তিনি রীতিমতো প্যাথলজিক্যাল অহমিকায় ভুগতেন। সেজন্যই তার একপেশে মতামতকে তিনি চূড়ান্ত বলে রায় দিয়ে দিতেন। নিজেকে তিনি সবজান্তা মনে করতেন যা অজ্ঞতার নামান্তর। আমার অবিশ্বাস গ্রন্থে হয়তো এজন্যই তিনি লিখতে পেরেছেন, 'দুই অন্ধকারের মাঝে ক্ষণিক আলোর ঝিলিক আমি, এই ঝিলিকটুকু আমার ভালো লাগে। আমার আগের ও পরের অন্ধকার সম্পর্কে যে আমি জানি না তা নয়; ওই অন্ধকারকে রহস্যময় বলে ভেবে আমি বিভোর নই, আমি জানি আমার আগে কী ছিলো, আমার পরে কী হবে। আমি জানি আমি কোনো মহাপরিকল্পনা নই, কোনো মহাপরিকল্পনার অংশ নই, আমাকে কেউ তার মহাপরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করেনি; একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে আমি জন্মেছি, অন্য একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে আমি মরে যাবো, থাকবো না; যেমন কেউ থাকবে না, কিছু থাকবে না।'

জঙ্গিবাদী লেখক

এরকম অতিসরলীকৃত ধারণার ফলে লেখালেখির অঙ্গনে ড. আজাদ এক ধরনের স্বেচ্ছাচার ও জঙ্গিবাদ মনে-প্রাণে লালন করে গেছেন। তিনি সবসময় ইসলামী মৌলবাদের বিরূপ সমালোচনা করতেন। অথচ মতাদর্শিক ক্ষেত্রে তিনি নিজে শুধু মৌলবাদী নন, ছিলেন জঙ্গিবাদী। যে কোনো ধরনের মৌলবাদে যদি নেতিবাচক কিছু থেকে থাকে তবে সেটা হলো, নিজের মতকে অন্যের ওপর জোর করে চাপানোর চেষ্টা। অনেক ক্ষেত্রে এই চেষ্টার অনিবার্য পরিণতি হয় সংঘাত ও সহিংসতা। এই চেষ্টার অংশ হিসেবে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্বিচার গণহত্যাও চলছে। হুমায়ুন আজাদের লেখা এবং কথাবার্তায় এই প্রবণতা পুরোমাত্রায় ছিল। হয়তো এজন্যই তিনি আফগানিস্থান ও ইরাকে মার্কিন হামলার কট্টর সমর্থক ছিলেন। আমেরিকাসহ সারা পৃথিবীর মানবতাবাদী লেখক-সাংবাদিক ও সুধী সমাজ যেখানে এই হামলার নিন্দায় মুখর, সেখানে হুমায়ুন আজাদ এর সমর্থন প্রকাশ্যেই করতেন।

একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিলে ড. আজাদের জঙ্গিবাদ সম্পর্কে ধারণা আরো পরিষ্কার হবে।

গত ২৩ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউম্যান সিকিউরিটির মুক্ত আলোচনায় ড. আজাদের বক্তৃতার পর একজন সাংবাদিক তার কাছে ইরানের মানবাধিকার নেত্রী ২০০৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী শিরিন এবাদীর একটি লেখার উদ্বৃতি তুলে ধরেন। এবাদী ২০০৪ সালের ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন রিপোর্টে লিখেছেন, 'কোনো সংস্কৃতিই মানুষের শোষণকে সহ্য করে না। কোনো ধর্মই নিরপরাধ মানুষকে হত্যার বিষয়টি অনুমোদন করে না। কোনো সভ্যতাই সহিংসতা বা সন্ত্রাসকে গ্রহণ করে না। নির্যাতন মানব বিবেকের কাছে ঘৃণিত। সব ঐতিহ্যেই নির্মমতা ও নৃশংসতা বীভৎস হিসেবে চিহ্নিত।.. এই ধারণাগুলো সার্বজনীন মানবাধিকারের ভিত্তি। আমরা যেন এই মৌলিক সত্যকে ধ্বংস না করি। যদি আমরা তা করি তাহলে দুর্বলের যাওয়ার মতো কোনো জায়গা থাকবে না।'

এই উদ্বৃতির কথা শুনে সেই সাংবাদিককে হুমায়ুন আজাদ বলেন, 'তুমিতো একটা মৌলবাদী; তোমার সঙ্গে কি কথা বলব।' ড. আজাদ সেসময় বলেন, 'শিরিন এবাদীর লেখা আলোচনার যোগ্য নয়; বরং সে কতজনের সঙ্গে শুয়েছে এ নিয়ে কথা হতে পারে।' তিনি বলেন, 'সব ধর্মই ক্ষতিকর। ইসলামে হত্যার সমর্থন রয়েছে।' ড. আজাদ তার মতই নাস্তিক্যবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন সম্পর্কেও একই ধরনের কথা বলতেন। তসলিমাকে তিনি স্রেফ পতিতা বলে উল্লেখ করতেন। ড. আজাদ নিজে যে কোনো বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ পুরোপুরি নিতেন অথচ অন্যের মতকে সহ্য করতে পারতেন না। তার সঙ্গে ভিন্নমতের কোনো অর্থপূর্ণ আলোচনা হতো না। এরই ফলে তার লেখা হতো এককথায় মারাত্মক একপেশে এবং বিভ্রান্তিকর।

নতুন বোতলে পুরনো মদ

গত তিন দশকের বেশী সময় ধরে ড. আজাদ লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। এ সময়ে তার লেখা ৬০টির বেশী বইয়ে অনেক অশালীন, সমাজ বিরোধী, মনগড়া, অসত্য বক্তব্য রয়েছে। লেখক জীবনের শেষ দিকে তিনি এ ধরনের লেখার দিকে আরো বেশী করে ঝুঁকে পড়েন। তবে ধর্মের বিরুদ্ধে হুমায়ুন আজাদ যেসব কথা বলেছেন সেগুলো ধারণা হিসেবে নতুন কিছু নয়। তার লেখার প্রায় সবই ছিল পুরনো কাসুন্দি। নতুন বোতলে পুরনো মদ বলতে যা বোঝায় এসব ছিল তাই। পাশ্চাত্যের মার্ক্স, এঙ্গেলস, হেগেল, নীটশে, জ্যাঁ পল সার্ত্রে, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ দার্শনিক ও লেখক এ ধরনের কথা অনেক আগেই বলে গেছেন। আজাদ যা করেছেন তা হলো, বাংলায় তিনি এসব ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও টীকা ভাষ্য রচনা করেছেন এবং স্বনামে প্রকাশ করেছেন। তার এসব রচনা পড়ে আনাড়ি পাঠকরা বিভ্রান্ত হতে পারেন। কিন্তু যারা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন তারা জানেন ধর্ম সম্পর্কে এ ধরনের উন্নাসিক ধারণা সেখানেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ৭০ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। এ নিয়ে অনেক লেখালেখিও হয়েছে। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ পুরনো দিনের বাতিল ধ্যান ধারণাই একরৈখিকভাবে প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো মহল থেকে তিনি এজন্য বাহবাও পেয়েছেন। বিশেষ করে দেশ-বিদেশের ইসলাম বিরোধী শক্তি তাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।